বিশ্বের ইতিকথা

শ্রীসুশোভন দত্ত

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত

। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

বিশ্বের ইতিকথা

শ্রীসুশোভন দত্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

যাঁহার গবেষণার ফলে নক্ষত্র ও সূর্য সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে, ভারতের সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার করকমলে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অর্পিত হইল।

দিল্লী ১৩৫১

গ্রন্থকার

ভূমিকা

চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও গতিবিধি সম্বন্ধে মানবের অনুসন্ধিৎসা চিরন্তন। মানবের সভ্যতার আদি-লীলাভূমি চীন, ভারতবর্ষ, ব্যাবিলন, ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি ভূখণ্ডে বহু সহস্র বৎসর পূর্বেও গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চলিত। বিগত তিন শত বৎসরে দূরবীক্ষণ, বর্ণলিপিযন্ত্র (spectrograph) ও ফটোগ্রাফির আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে জ্যোতির্বিদেরা মহাকাশে বহু নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাদের সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্বেও নক্ষত্রলোকের অধিবাসীদের জন্ম মৃত্যু ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সূর্যের অফুরন্ত তেজের উৎস কোথায়—দশ বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেন না। বিগত পঁচিশ বৎসরে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্নশাখায় বিবিধ আবিষ্কারের ফলে গ্রহনক্ষত্রের জন্মমৃত্যু ও জীবনযাত্রার উপর যে নূতন আলোকপাত হইয়াছে, এই পুস্তিকায় তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

এই পুস্তিকা প্রণয়নে শ্রীমতী যমুনা নাগ ও উমা দত্তের সহায়তা পাইয়াছি।

দিল্লী ১৩৫১ — গ্রন্থকার

সূচী

বিশ্বরূপ দর্শন	১
নক্ষত্রজগতের বর্ণপরিচয়	৪
সূর্যের জীবন-রহস্য	৮
জরা ও মৃত্যু	২৫
আকস্মিক দুর্ঘটনা	৩০
নক্ষত্রের শৈশব ও বিবর্তন	৩৪
নক্ষত্র ও গ্রহের জন্ম	৩৮
উপসংহার	৪১

বিশ্বরূপ-দর্শন

গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা আছে। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়া বলিলেন ঃ

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥

'হে অর্জুন, আমার এই বিরাটদেহে অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং আরও যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা আজ দর্শন কর।'

অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিলেন ঃ

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥

'আমি দেখিতেছি আপনার আদি মধ্য ও অন্ত কিছুই নাই; আপনি অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট; চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছেন।'

ভগবৎকৃপায় ভক্তের দিব্য দৃষ্টি লাভ ও বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত দূরবীক্ষণরূপ তৃতীয় নেত্রের সাহায্যে সাধারণ মানবও আজ যে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে গীতাকারের বর্ণিত বিশ্বরূপ অপেক্ষা তাহা বহুগুণে বিশাল ও বিস্ময়াবহ।

বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। বিশ্বসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের ইতিবৃত্ত জানিবার তাঁহার চেষ্টার বিরাম নাই। এই ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বিশ্বের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আসুন আমরা আলোকযানে আরোহণ করিয়া একবার বিশ্ব ভ্রমণ করিয়া আসি। আমাদের রথের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। ১½ সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা চন্দ্রকে অতিক্রম করিব। সূর্যে পৌঁছিতে লাগিবে আট মিনিট। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সৌরজগতের দূরতম প্রতিবেশী প্লুটোকে অতিক্রম করিব। অতঃপর দীর্ঘ চারি বৎসর কাল কেবল শূন্যের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর সৌরজগতের বাহিরে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী সেণ্টুয়ারি (Centauri) নামক নক্ষত্রে পৌঁছিব। আবার চারি বৎসর শূন্যে ভ্রমণের পরে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকে (Sirius) পৌঁছিব। লুব্ধককে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে শূন্যে পাড়ি দিতে হইবে। ১৩৫ বৎসর পরে আমরা কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে (Pleiades) উপস্থিত হইব। এই নক্ষত্রপুঞ্জের সাতটি মাত্র নক্ষত্র পৃথিবী হইতে নগ্ন চোখে দেখা যায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বহু সহস্র নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে অতিক্রম করিতে আমাদের প্রায় দশ বৎসর লাগিবে। কিছু দূরে আবার আর একটি নক্ষত্রপুঞ্জের (Hyades) সাক্ষাৎ মিলিবে। পরিষ্কার রাত্রে আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় তাহা বাস্তবিক এইরূপ বহু নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি। প্রায় দশ হাজার বৎসর পরে আমরা ছায়াপথের প্রান্তদেশে পৌঁছিব। সেইখানে নক্ষত্রপুঞ্জের ভীড় আরও বেশী। আমাদের নক্ষত্রজগত বা ছায়াপথে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ১০০০ কোটি। ছায়াপথের সীমা অতিক্রম করিবার পর প্রায় দশ লক্ষ বৎসর আমাদের শূন্যে ভ্রমণ করিতে হইবে। তাহার পর আমরা আবার আর একটি নক্ষত্রজগতে প্রবেশ করিব। ইহা

এণ্ড্রোমেডা (Andromeda) নীহারিকা নামে পরিচিত। আমাদের অনন্ত যাত্রাপথে আরও বহু লক্ষ নীহারিকার (নক্ষত্রজগতের) সাক্ষাৎ মিলিবে। দূরতম যে নীহারিকার[১] সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেইখানে আমরা পৌঁছিব ১৪ কোটি বৎসর পরে।

মহাশূন্যে অবিরাম চলিলে আমাদের যাত্রাপথের কোন শেষ সীমা মিলিবে কি? আইনস্টাইন ভরসা দিয়াছেন বিশ্বজগত সসীম ও শান্ত—ইহার ব্যাসের পরিমাণ ১২৪০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন আমাদের দৃষ্টিকে এই দূরত্বের এক-ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছে। বর্তমানে আমেরিকায় যে বৃহত্তম দূরবীন নির্মিত হইতেছে তাহা আমাদের দৃষ্টি আরও বহুদূর প্রসারিত করিবে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বৃহত্তর দূরবীনের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। কিন্তু আমাদের এই সসীম বিশ্বের সীমার বাহিরে কি আছে, তাহার কোনও জবাব বৈজ্ঞানিক কোনও দিন দিতে পারিবে কি?

বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই শূন্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে—কেবল ইতস্তত কতকগুলি নীহারিকা (নক্ষত্রজগত) মহাসমুদ্রে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের মত বিরাজ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকের দূরবীনে আজ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকা বা নক্ষত্রজগতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক এডিংটনের হিসাবে বিশ্বে ১,০০০,০০০,০০০,০০০ নক্ষত্রজগত আছে। প্রত্যেকটি নক্ষত্রজগতে নক্ষত্রের সংখ্যা ১০,০০০,০০০,০০০। মহাশূন্যে বিরাজিত এই অগণিত নক্ষত্ররাজির প্রত্যেকেই ক্ষুদ্রবৃহৎ এক একটি সূর্য।

---

১ এই শ্রেণীর নীহারিকা (Galactic) বহু শত কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি। দূরত্ব হেতু নক্ষত্রগুলিকে পৃথক রূপে দেখা যায় না। আর এক শ্রেণীর নীহারিকা (Gaseous nebula) আছে, তাহা এক অতি সূক্ষ্ম বাষ্পসমষ্টি মাত্র।

নক্ষত্রজগতের বর্ণপরিচয়

নক্ষত্রজগতের অধিবাসী সাধারণ নক্ষত্রের আয়ু বহুশত কোটি বৎসর। ইহার তুলনায় সমগ্র মানব-সভ্যতার যুগ (কয়েক সহস্র বৎসর) নিমেষ মাত্র। এই জগতের অধিবাসীদের জন্ম, শৈশব, যৌবন, জরা ও মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ইতিবৃত্ত রচনা করিতে হইলে কয়েক শত কোটি বৎসর অপেক্ষা করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কি উপায়ে এই সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ?

কোন ব্যক্তিকে বহু বৃক্ষশোভিত বনে লইয়া গিয়া যদি বলা হয় এক ঘণ্টা কাল এই বনে বিচরণ করিয়া তোমাকে এই বনের বৃক্ষরাজির জীবনচরিত বিবৃত করিতে হইবে তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারে ? অঙ্কুর হইতে বাহির হইয়া পূর্ণ যৌবন লাভ করিতে অনেক বৃক্ষের বহু বৎসর লাগে। একটি বৃক্ষ লইয়া পর্যবেক্ষণ করিলে এক ঘণ্টাকালের মধ্যে নূতন একটি পত্রোদ্গমও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু অল্পকাল চতুর্দিকে বিচরণ করিলে বৃক্ষের অঙ্কুর হইতে সদ্য-উদ্গত বৃক্ষ, অপরিণত বয়স্ক, পরিণত বয়স্ক, জরাগ্রস্ত বৃক্ষ ও মৃত বৃক্ষকাণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং যদিও একটি বৃক্ষের জীবনকালের তুলনায় এক ঘণ্টাকাল খুবই অল্প সময়, তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যেও বৃক্ষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে না।

নক্ষত্রের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে বৈজ্ঞানিককে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। নক্ষত্রজগতে শিশু, পরিণত বয়স্ক এবং জরাগ্রস্ত নক্ষত্র সবই আছে। ইহাদের সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তাহা বিশ্লেষণ করিয়া নক্ষত্রের জীবনরহস্য ও নক্ষত্রজগতের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করা সম্ভব।

সৌরজগতের গ্রহ কয়েকটি ব্যতীত আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক

একটি বিরাট সূর্য। অত্যধিক দূরত্বের জন্য ইহাদের এত ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ মনে হয়। আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকের দীপ্তি সূর্যের প্রায় ৪০ গুণ। ইহার দূরত্ব ৫২,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল, অর্থাৎ সূর্যের দূরত্বের প্রায় ৫ লক্ষ গুণ। লুব্ধকের দূরত্ব সূর্যের সমান হইলে ইহা হইতে চল্লিশটি সূর্যের সমান আলো ও তাপ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত। সূর্য অপেক্ষা দীপ্তিমান নক্ষত্র আরও অনেক দেখা যায়। আমাদের সুপরিচিত নক্ষত্রগুলির সহিত সূর্যের দীপ্তির তুলনা করিলে বলা যায় সূর্য মধ্যম শ্রেণীর একটি নক্ষত্র।

তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে নক্ষত্রের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড নির্গত আলোকের বর্ণ হইতে তাপমাত্রার একটি পরিমাণ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রায় রক্তাভ আলো নির্গত হয়—তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোর বর্ণ ক্রমে পীতাভ, শাদা এবং সর্বশেষে নীলাভ হয়।

বিভিন্ন নক্ষত্রের আলোর বর্ণ বিশ্লেষণ করিলে, তাহাদের তাপমাত্রার একটি মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। রক্তাভ নক্ষত্রের তাপমাত্রা নীলাভ নক্ষত্রের তাপমাত্রা অপেক্ষা অনেক কম। নক্ষত্রের তাপমাত্রা[২] সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার আর একটি পদ্ধতি আছে। বর্ণলিপি-যন্ত্রে সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের আলোক পরীক্ষা করিলে অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা যায়—এইগুলি Fraunhoper রেখা নামে পরিচিত। সূর্য বা নক্ষত্র হইতে যে আলোক নির্গত হয় তাহা বর্ণলিপি-যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রই দেখিতে পাওয়া উচিত। কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্রের চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার একটি বাষ্পীয় বহিরাবরণ (chromosphere) থাকায় সূর্য ও নক্ষত্রের আলো এই

২ নক্ষত্রের তাপমাত্রা বলিতে নক্ষত্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা বুঝায়।

বাষ্পীয় বহিরাবরণের মধ্য দিয়া নির্গমনকালে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কতকগুলি আলোকতরঙ্গ পরিশোষিত (absorbed) হয়। ফলে বর্ণচ্ছত্রের বিশেষ বিশেষ স্থানে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ রেখার উদ্ভব হয়। এই সকল কৃষ্ণ রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়ত্ব (position and intensity) হইতে নক্ষত্রের বহিরাবরণের তাপমাত্রা ও সংগঠন সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিলে কৃষ্ণবর্ণ রেখাগুলির অবস্থান ও প্রগাঢ়ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা সর্বপ্রথম নক্ষত্রের তাপমাত্রার সহিত বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণ রেখা-গুলির অবস্থান ও প্রগাঢ়ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে বৈজ্ঞানিকরা সমুদয় নক্ষত্রমণ্ডলীকে দশ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এই দশটি শ্রেণীকে O, B, A, F, G, K, M, R, N, S, এই দশটি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।[৩] কোন্ শ্রেণীর নক্ষত্রের তাপমাত্রা কত তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

শ্রেণী	তাপমাত্রা (ডিগ্রী)
*O	২৩,০০০ ডিগ্রীর উপর
B	২৩,০০০
A	১১,০০০
F	৭,৪০০
G	৬,০০০
K	৫,১০০
M	৩,৪০০
R	৩,০০০ ডিগ্রীর নীচে
N	২,০০০ ,, ,,
S	

৩ বর্ণমালার ক্রম অনুসারে দশটি অক্ষর না লইয়া উপরের অক্ষরগুলির দ্বারা নক্ষত্র শ্রেণীর নামকরণ করার তাৎপর্য বুঝা কঠিন।

এই শ্রেণিবিভাগ অনুসারে সূর্য একটি পঞ্চম শ্রেণীর (G. Class) সাধারণ নক্ষত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্রগুলিকে আলোক বিকীরণের ক্ষমতা অনুসারে সাজাইলে দেখা যায় সাধারণত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোক বিকীরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কতকগুলি নক্ষত্রে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এক শ্রেণীর নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া সত্ত্বেও আলোক বিকীরণের ক্ষমতা খুব বেশি। এই নক্ষত্রগুলির আয়তন খুব বিশাল। বৈজ্ঞানিকের নিকট ইহারা red giants (রক্তবর্ণ দানব) নামে পরিচিত। আরও এক শ্রেণীর নক্ষত্রে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অত্যধিক তাপমাত্রা সত্ত্বেও ইহাদের আলোক বিকীরণের ক্ষমতা খুব সামান্য। কারণ আর কিছুই নয় — ইহাদের আয়তন খুব ছোট। ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে white dwarfs (শ্বেত বামন)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র। সূর্যের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত সাধারণ নক্ষত্রের জীবনযাত্রার কোন বিশেষ পার্থক্য থাকা উচিত নয়। নক্ষত্রজগতে সূর্যই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সূর্যের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

সূর্যের জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু, সূর্যের অফুরন্ত শক্তির উৎস প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে নক্ষত্রজগতের অধি-বাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিব।

সূর্যের জীবন-রহস্য

অনন্ত আকাশে বিরাজমান চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে জ্যোতিষ্মান সূর্যই আদি মানবের নিকট বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রিশেষে উষাকালে দ্যুলোক ভূলোক আলোকিত করিয়া নবীন সূর্য যখন দিগন্তে দেখা দিত, প্রতি সন্ধ্যায় মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা ছড়াইয়া দিগন্তের সূর্য যখন অস্তাচলে যাইত, আদি মানবের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। সভ্যতার আদি লীলাভূমি মিশর, পারস্য, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে নানারূপে সূর্যের পূজা ও বন্দনা হইত। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠত্ব বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সন্ধান পাইয়াছেন বিশ্বকর্মার কারখানায় আরও বহু কোটি অনুরূপ সূর্য সৃষ্ট হইয়া নক্ষত্ররূপে অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতেছে। আয়তন ও দীপ্তিতে সূর্য তাহাদের অনেকের অপেক্ষা হীন। বিশ্বকর্মার সৃষ্টিতে সূর্য একটি নগণ্য ও অতি সাধারণ বস্তু।

বিশ্বের দরবারে সূর্যের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও পৃথিবীবাসী জীবের নিকট সূর্যের প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুদূর অতীতে বহুকোটি বৎসর পূর্বে কোন এক মহেন্দ্রক্ষণে নিজের বাষ্পীয় দেহের অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর জন্ম দেওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত সূর্যই পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস ও জীবনের আধার রূপে বিরাজ করিতেছে। সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে আসা বন্ধ হইলে নিরালোক পৃথিবীর বুকে সব জীবনীশক্তি অচল হইয়া যাইবে। সূর্যের জীবন-মরণের সহিত আমাদের পৃথিবীর জীবন-প্রবাহের অতি নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। অতএব স্বার্থের খাতিরেও পৃথিবীবাসী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সূর্যের জীবনীশক্তির উৎসের সন্ধান লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রতি বৎসর সমস্ত পৃথিবীতে কয়লা, খনিজ তৈল ও অন্যান্য পদার্থ

জ্বালাইয়া যে পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি করা হয়, তাহা অপেক্ষা বহু লক্ষ গুণ অধিক শক্তি সূর্যের আলো ও তাপরূপে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। প্রতি সেকেণ্ডে কি পরিমাণ সৌরতেজ আলো ও তাপরশ্মিরূপে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়িতেছে তাহার পরিমাপ করা সম্ভব। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫ সেকেণ্ডে এক কেলরি (calory)[৪] পরিমাণ সৌরতেজ আসিয়া পড়ে। একটি ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণে ২৪ ঘণ্টায় যে পরিমাণ সৌরতেজ আসিয়া পড়ে, কয়লা জ্বালাইয়া তাহা সৃষ্টি করিতে হইলে বেশ কিছু টাকার কয়লার প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ মাইলে সূর্যের যে আলোক ও তাপরশ্মি আসিয়া পড়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারিলে প্রায় ৪৭ লক্ষ অশ্বশক্তি (Horse Power) পাওয়া যাইত। সূর্য হইতে নিরন্তর যে আলোক ও তাপরশ্মি বিকীরণ হইতেছে তাহার সামান্য এক অংশই পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, বাকি সবটা অনন্ত মহাশূন্যে ছড়াইয়া পড়ে। গণনার ফলে দেখা যায় সূর্য হইতে সেকেণ্ডে ৯×১০^{২৫} † কেলরি তাপ নির্গত হইতেছে—সৌরপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চি হইতে সেকেণ্ডে নির্গত তাপের পরিমাণ ৯,২০০ কেলরি।

নির্গত তাপের পরিমাণ হইতে সূর্যের তাপমাত্রার একটি পরিমাপ পাওয়া যায়। লৌহখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া যখন লালবর্ণ ধারণ করে (তাপমাত্রা প্রায় ৫০০ ডিগ্রী হইলে) তাহার প্রতি বর্গ ইঞ্চি হইতে সেকেণ্ডে প্রায় ৩ কেলরি তাপ নির্গত হয়। কত তাপমাত্রায় কি হারে তাপ নির্গত হইবে তাহা একটি বিশিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে। এই নিয়ম অনুসারে গণনার ফলে দেখা যায়, সৌরপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৬,০০০ ডিগ্রী। এই তাপমাত্রায়

---

৪ এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী উঠাইতে হইলে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক কেলরি বলা হয়।

† ৯ এর পর ২৫টি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হইবে। খুব বড় সংখ্যা লিখিতে এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়।

আমাদের পরিচিত যাবতীয় পদার্থই বাষ্পীয় রূপ ধারণ করিবে। বাস্তবিক সৌরপৃষ্ঠে সব পদার্থই বাষ্পীয় রূপে বর্তমান।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সূর্যের সূক্ষ্ম বাষ্পীয় বহিরাবরণই প্রত্যক্ষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। তবে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সার আর্থার এডিং-টনের গণনা ও গবেষণার ফলে আমরা সূর্যের আভ্যন্তরীণ আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এডিংটনের মতে সৌরপৃষ্ঠে তাপমাত্রা ৬,০০০ ডিগ্রী, চাপ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের সহস্র ভাগের এক ভাগ এবং বস্তুগুরুত্ব ·০০০০০০০০০০০০০০৯৭ সৌরপৃষ্ঠ হইতে সূর্যের কেন্দ্রাভিমুখে চলিলে তাপমাত্রা, চাপ ও বস্তুগুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অর্ধপথে তাপমাত্রা ৫০,০০,০০০ ডিগ্রী, চাপ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের ১,০০০,০০০,০০০ গুণ এবং বস্তুগুরুত্ব ২$\frac{১}{২}$, ঠিক কেন্দ্র স্থলে তাপমাত্রা ২০,০০০,০০০ ডিগ্রী, চাপ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের ১০,০০০,০০০,০০০ গুণ এবং বস্তুগুরুত্ব ৮৫। অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য সূর্যের মধ্যে সব পদার্থ বাষ্পীয় রূপে আছে বটে, কিন্তু সূর্যের আভ্যন্তরীণ বাষ্পীয় পদার্থ আমাদের পরিচিত সাধারণ বাষ্পীয় পদার্থের মত লঘু নয়। অত্যধিক আভ্যন্তরীণ চাপের জন্য তাহাদের গুরুত্ব অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। সাধারণ তরল বা কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তাহাদের বস্তুগুরুত্ব অধিক। এডিংটনের মতে সূর্যের আভ্যন্তরীণ বাষ্পীয় পদার্থের বস্তুগুরুত্ব পারদের গুরুত্বের কয়েক গুণ বেশী।

পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি হইবার পর সূর্যের জীবনযাত্রায় কোনোরূপ বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে জ্যোতিষ্মান সূর্যের মহিমা নির্বাক বিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন, মধ্য-এসিয়ায় বা উত্তর-ভারতে বৈদিক ঋষি যে সূর্যের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সবিতৃস্তব রচনা করিয়াছিলেন, পলাশীর রণক্ষেত্রে সায়াহ্নের যে অস্তগামী সূর্যকে সম্বোধন করিয়া বাংলার শেষ হিন্দুবীর মোহনলাল আক্ষেপ করিয়াছিলেন,

সেই সূর্য ও আজিকার সূর্যে কোনই পার্থক্য নাই। অবশ্য ইহা হইতে সূর্যের আয়ু অথবা জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা অর্থহীন—কারণ সূর্যের জীবন-পঞ্জীতে পৃথিবীতে মানব-সভ্যতার যুগ (কয়েক সহস্র বৎসর মাত্র) এক নিমেষ তুল্য। ভূগর্ভে বিভিন্ন স্তরে প্রস্তরীভূত যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও প্রমাণ হয় কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্যের দীপ্তি বা তেজ বিকীরণের ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য হয় নাই। সূর্যের তেজ বিকীরণের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। সূর্যের তেজ বিকীরণের ক্ষমতা কমিয়া অর্ধেক হইলে পৃথিবীর সমস্ত জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবে এবং তেজ বিকীরণের ক্ষমতা চারিগুণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত জল বাষ্পে পরিণত হইবে। বিগত কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে সূর্যের জীবন-যাত্রায় এইরূপ পরিবর্তন ঘটিলে সেই অবস্থায় পৃথিবীতে আমাদের পরিচিত সাধারণ জীব বা উদ্ভিদের উদ্ভব বা স্থিতি সম্ভব হইত না।

প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ অথবা গণনা হইতে সূর্যের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নক্ষত্রমণ্ডলীর চলাচল পর্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি হইয়াছে ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে। তাহারও পূর্বে ছিল বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া এক সূক্ষ্ম বাষ্প মাত্র। সূর্য নক্ষত্রজগতে বয়োজ্যেষ্ঠ, এইরূপ অনুমান করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। এইরূপ অনুমান করিলেও সূর্যের বয়সের উর্ধ্ব সীমা ২০০ কোটি বৎসর।

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করিতে পারিলে, সূর্যের বয়সের নিম্নসীমা জানা যায়, কারণ সূর্য হইতেই পৃথিবীর জন্ম। সূর্যের বাষ্পীয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকাল পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হয় তাহা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও, পৃথিবীর জন্মের অল্পকাল পরেই ভূপৃষ্ঠ যে কঠিন স্তরে আবৃত হইয়া পড়ে তাহার বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর

স্থানে স্থানে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের পরমাণু হইতে অবিরত আলফা-কণা, ইলেকট্রন ও তেজরশ্মি নির্গত হয় এবং পরমাণুগুলি রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে সীসকের পরমাণুতে পরিণত হয়। এই রূপান্তর-ক্রিয়া ঘটে অতি ধীর গতিতে— কিছু পরিমাণ ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম সম্পূর্ণ সীসকে পরিণত হইতে কয়েক শত কোটি বৎসর লাগিবে। ভূপৃষ্ঠে যে সকল স্থানে এই জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেইখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সহিত কি পরিমাণে সীসক মিশ্রিত আছে, তাহার পরিমাপ করিতে পারিলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের কত অংশ সীসকে রূপান্তরিত হইয়াছে জানা যায় এবং ভূপৃষ্ঠের সেই স্তরের বয়স নির্ধারণ করা যায়। এইরূপ গণনার ফলে ভূপৃষ্ঠের কঠিন স্তরের বয়স ১৬০ কোটি বৎসর বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। পৃথিবীর জন্মকাল ১৬০ কোটি বৎসরের অল্প কিছু পূর্বে। অতএব সূর্যের বয়সের ঊর্ধ্ব সীমা ২০০ কোটি বৎসর এবং নিম্ন সীমা ১৬০ কোটি বৎসরের কিছু বেশি।

সূর্য হইতে প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হইতেছে, পূর্বেও এই হারে তাপ নির্গত হইয়া থাকিলে সূর্যের জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত সূর্য্য হইতে $৫{\cdot}৭ \times ১০^{৪১}$ কেলরি তাপ নির্গত হইয়াছে এবং সূর্যের প্রতি গ্রাম পদার্থ হইতে ২৮,০০,০০০,০০০ কেলরি তাপ নির্গত হইয়াছে। এক গ্রাম কয়লা সম্পূর্ণ জ্বলিলে প্রায় ৭০০০ কেলরি তাপ পাওয়া যায়। উপরোক্ত গণনা হইতে দেখা যায় সূর্যের জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত সূর্য হইতে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হইয়াছে কয়লা জ্বালাইয়া তাহা উৎপাদন করিতে হইলে সূর্যের ওজনের ৪ লক্ষ কয়লার সূর্য জ্বালান প্রয়োজন হইত। বাস্তবিক কিছু জ্বলিয়া এত অধিক পরিমাণে তাপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কোনও পদার্থ জ্বলিয়া যায়, সূর্যে সেই প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটা সম্ভব নয়। কয়লা জ্বলিলে

কার্বন ও অক্সিজেন সংযোগে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। অন্যান্য প্রজ্বলন ব্যাপারেও এই প্রকার রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। কিন্তু সূর্যের তাপমাত্রা এত বেশি যে সেখানে এই প্রকার রাসায়নিক সংযোগ ঘটা সম্ভব নয়। বরঞ্চ কোনও যৌগিক পদার্থ সেখানে লইয়া গেলে অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহা বিযুক্ত হইয়া কতকগুলি মৌলিক পদার্থে পরিণত হইবে। সূর্যে কার্বন ও অক্সিজেন সংযোগে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি কখনও হইতে পারে না— পরন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড আনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত হইয়া কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হইবে। সূর্যের গঠনোপাদান হইতেছে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ—কোনও যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব সেখানে সম্ভব নয়। সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সূর্যের তাপ সৃষ্টি হইতেছে এইরূপ অনুমান করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোৎজ মত প্রকাশ করেন মহাকর্ষজনিত (gravitational) সংকোচনের ফলে সূর্যের তাপ সৃষ্টি হয়। তাঁহার মতে সূর্য্য আদিতে এক বিশাল অনুত্তপ্ত বাষ্পসমষ্টিরূপে জীবন আরম্ভ করে। এই বিশাল বাষ্পীয় অবয়বের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মহাকর্ষজনিত আকর্ষণের ফলে সূর্যদেহে দ্রুত সংকোচন হওয়া উচিত। সংকোচনের ফলে সূর্যদেহের অভ্যন্তরে বাষ্পের উপর চাপ পড়িবে। আবদ্ধ বায়ুর উপর চাপ দিলে তাহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সূর্যদেহের সংকোচনের ফলে যে আভ্যন্তরীণ চাপের সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে সূর্যদেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে আবার দেহের প্রসারণের সম্ভাবনা দেখা দিবে। অতএব এমন একটি অবস্থা আসা উচিত যখন সূর্যদেহের সংকোচনও হইবে না এবং প্রসারণও হইবে না। কিন্তু সৌরপৃষ্ঠ হইতে অনবরত তাপ নির্গত হইতেছে, অতএব সূর্যের তাপমাত্রা স্থির রাখিতে হইলে সূর্যদেহের ক্রমাগত সংকুচিত হওয়া প্রয়োজন।

হেলম্‌হোৎজের মতে সূর্যদেহের অনবরত সংকোচনের ফলেই সূর্য হইতে অবিরাম তাপ নির্গত হয়, এবং সৌরতেজের উৎস মহাকর্ষ শক্তি।

হেলম্‌হোৎজের মতবাদ অনুসারে গণনা করিলে সূর্যের তাপসৃষ্টির জন্য প্রতি লক্ষ বৎসরে সূর্যের ব্যাস শতকরা তিন ভাগ কমা উচিত। সূর্যদেহের এইরূপ দ্রুত সংকোচন হইলে সহজেই ধরা পড়িত। আদিতে সূর্যের যে বিশাল অবয়ব ছিল তাহা সংকুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্যের সেই আদি বিশাল অবয়ব সংকুচিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করার ফলে যে পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, বাস্তবিক আজ পর্যন্ত সূর্য হইতে তাহার সহস্রগুণ অধিক তাপ নির্গত হইয়াছে। অতএব মহাকর্ষজনিত সংকোচনই সূর্যের তাপসৃষ্টির একমাত্র উৎস হইতে পারে না। সূর্যে তাপসৃষ্টির অন্য উৎসও আছে। তবে সূর্যের প্রথম জীবনে দেহসংকোচনের ফলে সৌরতেজের সৃষ্টি হইত, হেলম্‌হোৎজের এই অনুমান ভুল নয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা সৌরতেজের উৎসের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। বিগত কয়েক বৎসরে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে পরমাণুর কেন্দ্রমধ্যে এক বিরাট শক্তির ভাণ্ডারের সন্ধান মিলিয়াছে। আঘাত-সংঘাতের ফলে পরমাণুর কেন্দ্রের কোনোরূপ ভাঙন ঘটাইতে পারিলে সময় সময় প্রচণ্ড আণবিক শক্তির এক অংশ মুক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসে। সূর্য হইতে অনুক্ষণ যে অজস্র তেজ বিকীরণ হইতেছে তাহার উৎসের সন্ধান মিলিয়াছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কতকগুলি পরমাণুর কেন্দ্রের আঘাত-সংঘাত এবং ভাঙাচোরার মধ্যে।

এক শ্রেণীর তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির স্বতঃ-বিকীরণ হয়। পৃথিবীতে অল্প পরিমাণ এই জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান মিলে। সূর্যেও এই শ্রেণীর তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনা

আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ কখনই এত বেশী নয় যে তাহা হইতে এত পরিমাণ সৌরতেজ সৃষ্টি হইবে। অবস্থাবিশেষে সাধারণ পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রেরও এমন রূপান্তর ঘটা সম্ভব যাহার ফলে তাহা হইতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর ন্যায় তেজ বিকীরণ হইতে থাকিবে। এই প্রকার ব্যাপারই সূর্যে নিরন্তর ঘটিতেছে এবং আণবিক শক্তির মুক্তির ফলেই অফুরন্ত সৌরতেজ সৃষ্ট হইতেছে। পরমাণুর কেন্দ্রের রূপান্তরের ফলে যে আণবিক শক্তি পাওয়া যায়, সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শক্তির তুলনায় তাহা বহু লক্ষগুণ বেশি। সূর্য হইতে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হইতেছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা উৎপাদিত হইলে পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের মধ্যে সূর্য জ্বলিয়া শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু আণবিক শক্তি হইতে সৌরতেজ সৃষ্টি হওয়ার জন্য সূর্যের পক্ষে বহু কোটি বৎসর এই পরিমাণ সৌরতেজ বিকীরণ করা সম্ভব হইতেছে।

পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে তেজসৃষ্টির রহস্য বুঝিতে হইলে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। পরমাণু ভাঙাচোরার ফলে পরমাণু গঠনের কয়েকটি মূল উপাদানের সহিত বৈজ্ঞানিকের পরিচয় ঘটিয়াছে। ইলেক্ট্রনের সহিত বৈজ্ঞানিকের পরিচয় হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। ইহারা ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎকণা ; ভর (mass) হাইড্রোজেন পরমাণুর $\frac{১}{১৮৩০}$। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে লর্ড রাদারফোর্ডের অনুসন্ধানের ফলে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে প্রথম পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের সন্ধান মিলে। প্রোটনের ভর প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। ইহাদের বিদ্যুতভার ইলেক্ট্রনের সমান কিন্তু বিপরীত-ধর্মী। দশ-বার বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল প্রোটন ও ইলেক্ট্রনই যাবতীয় পদার্থের পরমাণু গঠনের মূল উপাদান। রাদারফোর্ড মত প্রকাশ করিয়াছিলেন পরমাণুর কেন্দ্রে বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সমাবেশ হয় এবং এই কেন্দ্রের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে কতকগুলি

ইলেক্ট্রন ঘুরিতে থাকে—ঠিক সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষে যেমন কতকগুলি গ্রহ ঘুরিতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমাণুর আরও কয়েকটি গঠনোপাদানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং পরমাণুর কেন্দ্রগঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে প্রথম পজিট্রনের সন্ধান মিলে। ইহারা ইলেক্ট্রনের বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণা; ভর ইলেক্ট্রনেরই সমান। কিছুদিন পরে এক শ্রেণীর ভারী ইলেক্ট্রনের (meson) সন্ধান মিলিল— ইহাদের ভর সাধারণ ইলেক্ট্রনের ১৫০।২০০ গুণ, কিন্তু বিদ্যুতভার ইলেক্ট্রনের সমান। পরমাণুর আর একটি মূল উপাদানের সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা পাইয়াছেন—ইহা নিউট্রন নামে পরিচিত। নিউট্রনের ভার প্রায় প্রোটনের সমান, কিন্তু নিউট্রনের পজিটিভ্ কিংবা নেগেটিভ্ কোন প্রকার বিদ্যুৎভার থাকে না। একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্ট্রন সংযোগে একটি নিউট্রন, এবং একটি নিউট্রন ও একটি পজিট্রন সংযোগে একটি প্রোটন পাওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সব পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রের মূল উপাদান হইতেছে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন। হিলিয়াম কেন্দ্রে আছে ২টি নিউট্রন ও ২টি প্রোটন। এলুমিনিয়ম কেন্দ্রে আছে ১৩টি প্রোটন ও ১৪টি নিউট্রন। যেসব পদার্থের পরমাণুর ভর আরও বেশি, তাহাদের কেন্দ্রে আরও বেশি সংখ্যায় নিউট্রন ও প্রোটন আছে। পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ভর করে পরমাণুর বাহিরের কক্ষে কত ইলেক্ট্রন এবং কেন্দ্রে কত প্রোটন আছে তাহার উপর। আণবিক ওজন নির্ভর করে কেন্দ্রে কত নিউট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি আছে তাহার উপর। কোনও কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যার কিছু তারতম্য দেখা যায়, ফলে তাহাদের আণবিক ওজনে পার্থক্য হয়।

একই পদার্থের বিভিন্ন আণবিক ওজনের এইসব পরমাণুর রাসায়নিক প্রকৃতিতে কোনও তারতম্য দেখা যায় না। ইহাদিগকে আইসোটোপ বলা হয়। প্রত্যেক অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা ৮ কিন্তু কোনও অক্সিজেন কেন্দ্রে ৮টি, কোনওটিতে ৯টি, কোনওটিতে ১০টি পর্যন্ত নিউট্রন থাকে। অধিকাংশ অক্সিজেন কেন্দ্রে ৮টি নিউট্রন থাকে—৯টি কিংবা ১০টি নিউট্রন সমেত অক্সিজেন কেন্দ্র খুব বিরল। ফলে, ১৬, ১৭, ১৮ এই তিন আণবিক ওজনের অক্সিজেন-পরমাণু দেখা যায়। অবশ্য ১৬ আণবিক ওজনের অক্সিজেন-পরমাণুর সংখ্যাই খুব বেশি। অনেক মৌলিক পদার্থের দুই বা ততোধিক আইসোটোপ আছে। বিশ্বে আমরা মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু এই ৯২টি পদার্থের বিভিন্ন প্রকার ৩৮০ আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি আইসোটোপ আবার তেজস্ক্রিয় এবং ক্ষণস্থায়ী। তাহাদের পরমাণু হইতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর মত তেজ বিকীরণ হয় এবং ফলে তাহারা ভিন্ন পদার্থের স্থায়ী পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়।

কোন্ পরমাণুর কেন্দ্রে কতগুলি নিউট্রন ও প্রোটন আছে জানা থাকিলে নিউট্রন ও প্রোটন সমষ্টির ভর হইতে সেই পরমাণুর কেন্দ্রের ভর গণনা করা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা একটি খুব আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। কয়েকটি নিউট্রন ও প্রোটন সংযোগে কোনও পরমাণুর কেন্দ্র গঠিত হইলে তাহার ভর সেই প্রোটন ও নিউট্রন সমষ্টির সম্মিলিত ভর অপেক্ষা সামান্য কম হয়। দুইটি নিউট্রন ও দুইটি প্রোটন সংযোগে একটি হিলিয়াম কেন্দ্র গঠিত হইলে ভর প্রায় শতকরা এক ভাগ কমিয়া যায়। বিজ্ঞান জড়ের বিনাশ স্বীকার করে না। নিউট্রন ও প্রোটন সংযোগে কেন্দ্রগঠনের সময় এই যে সামান্য জড়ের বিলোপ হইল তাহা রূপান্তরিত হয় প্রচণ্ড শক্তিতে। অধ্যাপক আইনস্টাইন জড় ও শক্তির পরস্পরের রূপান্তর সম্ভব, এই মত প্রথম প্রচার করেন। কি

পরিমাণ জড়ের বিলোপে কতটা শক্তি সৃষ্টি হইবে তাহাও তাঁহার গণনা হইতে জানা যায়।

১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড রাদারফোর্ড প্রথম তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত আল্‌ফা কণার আঘাতে নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙেন। কিছুকাল পরে তিনি আরও কোনও কোনও পদার্থের পরমাণু ভাঙিতে সমর্থ হন। ইদানীং অধ্যাপক লরেন্স কর্তৃক উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রন নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু ভাঙাচোরার কাজ খুব সহজ হইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানাগারে এই যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রের রূপান্তর সম্বন্ধে নানা রকম পরীক্ষা চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাও লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন হাইড্রোজেন কেন্দ্র অথবা প্রোটনকে, বন্দুকের গুলির মত, পদার্থের পরমাণুর মধ্য দিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। এই গুলির আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্র ভাঙিয়া রূপান্তর ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরমাণুর কেন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তির অংশ মুক্ত হইয়া আসে।

সূর্যের অভ্যন্তরেও যদি কোনও উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রের ভাঙাচোরা বা রূপান্তর-প্রক্রিয়া ঘটান যায় তাহা হইলে প্রচণ্ড আণবিক শক্তি মুক্ত হইবে এবং সূর্যের অফুরন্ত শক্তির উৎস জোগাইবে। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে খুব দ্রুতবেগশীল প্রোটন সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আঘাতের ফলে পরমাণুর কেন্দ্র ভাঙিয়া রূপান্তর ঘটান সম্ভব হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও স্বতঃই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু ব্যতীত কোনও সাধারণ পরমাণুর রূপান্তর কখনও ঘটে না। সূর্যে স্বতঃই সাধারণ পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রের ভাঙাচোরা ও রূপান্তর ঘটা কি সম্ভব ?

Atkinson ও Houterman কয়েক বৎসর পূর্বে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন। সূর্যে সব পদার্থই বাষ্পীয় রূপে বর্তমান।

বাষ্পীয় অবস্থায় সব পদার্থের পরমাণু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইতস্তত ছুটিয়া বেড়ায় এবং প্রতি সেকেণ্ডে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বার সংঘাত ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পরমাণুর গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়—পরস্পর সংঘর্ষও দ্রুততর হইতে থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় দুইটি পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে তাহাদের কোনও প্রকার বিকৃতি বা রূপান্তর হইতে দেখা যায় না। অত্যধিক তাপমাত্রায় পরমাণুর স্বাভাবিক রূপ থাকে না এবং পরস্পর সংঘর্ষের ফলে তাহাদের কেন্দ্রগুলির রূপান্তর ঘটিতে পারে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা দেখাইয়াছেন অত্যধিক তাপমাত্রায় পরমাণুর বাহিরের কক্ষের ঘূর্ণীয়মান ইলেক্‌ট্রনগুলি একে একে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যায়। কত তাপমাত্রায় কোন্ পরমাণু হইতে কি পরিমাণ ইলেক্ট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, অধ্যাপক সাহার নিয়মানুসারে তাহা গণনা করা সম্ভব। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা দুই কোটি ডিগ্রী। এই তাপমাত্রায় পৌঁছিবার বহু পূর্বেই সব পদার্থের পরমাণুর বাহির কক্ষের ইলেক্ট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং পরমাণুর কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে ইলেক্ট্রন-খোলস মুক্ত হইবে। অতএব সূর্যের অভ্যন্তরে আছে কতকগুলি ইলেক্ট্রন-খোলস মুক্ত পরমাণুর কেন্দ্র এবং পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন। অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য ইহাদের গতিবেগ অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং পরস্পর সংঘর্ষও খুব দ্রুত হয়। গতিশীল পদার্থ মাত্রেরই কিছু পরিমাণ গতিবেগ-জনিত শক্তি থাকে। গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গতিবেগ দ্বিগুণ হইলে শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, গতিবেগ তিন গুণ হইলে, শক্তি বৃদ্ধি পাইবে নয় গুণ। সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রগুলির গতিবেগজনিত শক্তি এত প্রচণ্ড হয় যে তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে তাহাদের ভাঙাচোরা ও রূপান্তর ঘটা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের পরমাণুর রূপান্তর ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন প্রোটন প্রভৃতি যেসকল কণিকা

ব্যবহার করেন তাহাদের যে পরিমাণ শক্তি থাকে, দুই কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রের গতিবেগজনিত শক্তিও তাহার কাছাকাছি হইবে। অতএব অত্যধিক তাপমাত্রায় (বহু লক্ষ ডিগ্রী) নিয়ত সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর কেন্দ্রগুলির ভাঙাচোরা ও রূপান্তর ঘটিতে থাকিবে, ফলে প্রচণ্ড আণবিক শক্তির অংশ মুক্ত হইয়া নির্গত হইবে। এইরূপ উত্তপ্ত অবস্থায় কিছু হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম একত্রে থাকিলে কেন্দ্রগুলির নিয়ত সংঘর্ষের ফলে তাহারা হিলিয়াম কেন্দ্রে রূপান্তরিত হইতে থাকিবে এবং বহুল পরিমাণ আণবিক শক্তি সৃষ্টি হইবে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে এবং অবশিষ্ট হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম কেন্দ্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষ আরও দ্রুততর হইবে এবং তাহাদের হিলিয়াম কেন্দ্রে রূপান্তর আরও দ্রুত হইবে। একবার কোনও উপায়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করিয়া দিলে সে প্রক্রিয়া আপনা হইতে চলিতে থাকিবে—বাহির হইতে আর উত্তাপের যোগান দিতে হইবে না।

কত তাপমাত্রায় পরমাণুর কেন্দ্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষে রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ করিবে ? যে সকল পরমাণুর কেন্দ্রের ভর এবং বিদ্যুৎভার অল্প তাহাদের রূপান্তর অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রায় ঘটিবে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ভারী কেন্দ্রগুলিরও রূপান্তর ঘটা সম্ভব হয়। Atkinson ও Houterman কত তাপমাত্রায় কত আণবিক সংখ্যার পরমাণুর তাপমাত্রাজনিত সংঘর্ষের ফলে কি হারে রূপান্তর ঘটিবে তাহা গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক গ্রাম হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম পরমাণুর সংমিশ্রণ (এক ভাগ হাইড্রোজেন ও সাত ভাগ লিথিয়াম) সম্পূর্ণরূপে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হইলে ২২,০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কেলরি আণবিক শক্তি নির্গত হইবে। কিন্তু তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রী হইলেও এই রূপান্তর এত ধীরে ধীরে ঘটিবে যে কয়েক পাউণ্ড হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম সংমিশ্রণ হইতে প্রাপ্ত শক্তি হইতে একটি মোটরগাড়ী চালান

সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রী হইলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত হাইড্রোজেন ও লিথিয়ামের রূপান্তর ঘটিবে এবং সহসা প্রবল আণবিক শক্তি মুক্ত হওয়ার ফলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইবে। কিন্তু দুই কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রাতে হাইড্রোজেনের সহিত অন্য ভারী পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে রূপান্তর খুবই ধীরে ধীরে হয়। আবার আল্‌ফা-কণার সহিত খুব হল্কা পরমাণু-কেন্দ্রের সংঘর্ষের ফলে রূপান্তর ৫ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রার কমে হয় না। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রী—এই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্র (প্রোটন) এবং কোনও কোনও হাল্কা অণুর কেন্দ্রের সংঘর্ষে দ্রুত রূপান্তর ঘটা সম্ভব এবং তাহার ফলে সৌরতেজ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এডিংটন সূর্যের গঠনোপাদান সম্বন্ধে যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় সূর্যে প্রচুর হাইড্রোজেন (শতকরা ৩৫ ভাগ) বর্তমান। কোন্ পদার্থের পরমাণুর সহিত হাইড্রোজেন কেন্দ্রের সংঘর্ষের ফলে সৌরতেজ সৃষ্টি হইতেছে অনুসন্ধান করিতে গেলে কোন্ কোন্ পরমাণুর সংঘর্ষজনিত রূপান্তরের ফলে আণবিক শক্তি সূর্য হইতে নির্গত শক্তির সহিত তুলনীয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম কেন্দ্রের সংঘর্ষের প্রশ্ন উঠে না, কারণ দুই কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও লিথিয়াম কেন্দ্র একত্র করিলে নিমেষের মধ্যে তাহাদের রূপান্তরের ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইয়া সমস্ত সূর্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। আবার দুই কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও ভারী কোনও পরমাণুর কেন্দ্র একত্র করিলে রূপান্তর এত ধীরে ধীরে হইবে যে তাহাতে সমস্ত সৌরতেজ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

অধ্যাপক বেটের (Bethe) গণনার ফলে কোন্ কোন্ পরমাণুর কেন্দ্রের সংঘর্ষ ও রূপান্তরের ফলে সৌরতেজ সৃষ্টি হইতেছে তাহা জানা গিয়াছে। সূর্যের অভ্যন্তরে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের সংঘর্ষে রূপান্তর-প্রক্রিয়া সুরু হয়। সংঘর্ষ ও রূপান্তরের ফলে শেষ পর্যন্ত

কার্বন-কেন্দ্র অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসে এবং চারিটি প্রোটন ও ছয়টি ইলেক্ট্রনের সংযোগে আল্‌ফা-কণা সৃষ্টি হয়। বেটের মতে নিম্নলিখিত রূপান্তর ঘটিয়া সূর্যে অবিরাম হাইড্রোজেন কমিতেছে এবং হিলিয়াম-কেন্দ্র সৃষ্টি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আণবিক তেজ সৃষ্টি হইতেছে।

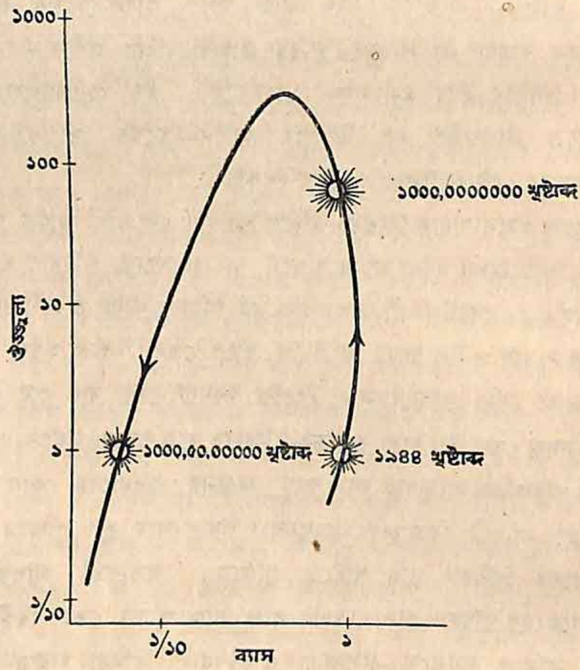
১২ আণবিক ওজনের কার্বন-কেন্দ্রের সঙ্গে একটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্র বা প্রোটনের সংঘর্ষের ফলে ১৩ ওজনের ক্ষণস্থায়ী নাইট্রোজেন-কেন্দ্র সৃষ্টি হয় ও তেজরশ্মি রূপে কিছু আণবিক শক্তি নির্গত হয়। (১) এই নাইট্রোজেন-কেন্দ্র হইতে একটি পজিট্রন নির্গত হইয়া অবশিষ্ট থাকে একটি ১৩ ওজনের কার্বন-কেন্দ্র। (২) ইহার সহিত আর একটি প্রোটনের সংঘর্ষের ফলে একটি ১৪ ওজনের নাইট্রোজেন-কেন্দ্র পাওয়া যায় ও কিছু আণবিক শক্তি তেজরশ্মিরূপে নির্গত হইয়া আসে। (৩) ১৪ ওজনের নাইট্রোজেনের কেন্দ্রের সহিত আবার একটি প্রোটনের সংঘর্ষে ১৫ ওজনের অক্সিজেন-কেন্দ্র সৃষ্টি হয় এবং তেজরশ্মিরূপে কিছু আণবিক শক্তি বাহির হইয়া আসে। (৪) ১৫ ওজনের অক্সিজেন-কেন্দ্রটি হইতে একটি পজিট্রন নির্গত হইয়া অবশিষ্ট থাকে ১৫ ওজনের নাইট্রোজেন-কেন্দ্র। (৫) ১৫ ওজনের নাইট্রোজেন কেন্দ্র ও একটি প্রোটনের সংঘর্ষে ১২ ওজনের কার্বন-কেন্দ্র ও ৪ ওজনের হিলিয়াম-কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। (৬) আবার ১২ ওজনের কার্বন-কেন্দ্র ও প্রোটনের সংঘর্ষে ১৩ ওজনের নাইট্রোজেন-কেন্দ্র ও তেজরশ্মি সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকে।

ছয় ধাপে উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি শেষ হয়। ফলে দাঁড়াইল যে কার্বন কেন্দ্র লইয়া ১ নং প্রক্রিয়া আরম্ভ, ৬ নং প্রক্রিয়ার শেষে সেই কার্বন অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসে। ১, ৩, ৪, ৬ নং প্রক্রিয়ায় চারিটি প্রোটন অংশ গ্রহণ করে। ২ ও ৫ নং প্রক্রিয়ায় ২টি পজিট্রন বিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে কোনও পরমাণু হইতে একটি পজিট্রন বিযুক্ত করা ও সেই পরমাণুতে একটি ইলেক্ট্রন যুক্ত করা সম্পূর্ণ এক কথা,

কারণ ইলেক্ট্রন ও পজিট্রন সমান ওজনের বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎকণা। সুতরাং উপরোক্ত ৬টি প্রক্রিয়ায় মোট ফল দাঁড়াইল ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেক্ট্রন সংযোগে একটি আল্‌ফা-কণা সৃষ্টি এবং তেজরশ্মিরূপে কিছু আণবিক শক্তির নির্গমন। কার্বন-কেন্দ্র সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর লাগে। সংঘর্ষের ফলে আজ যেসব কার্বন-কেন্দ্রের রূপান্তর স্বরু হইল, বারবার রূপ পরিবর্তন করিয়া তাহারা আবার স্বকীয় কার্বন রূপ ফিরিয়া পাইবে প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর পরে। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে পৃথিবীতে তাপসৃষ্টির মূল উপাদান কার্বন—সূর্যেও তাপসৃষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে সেই কার্বনেরই সহায়তা দরকার।

সূর্যের গঠনোপাদান বিশ্লেষণ করিলে শতকরা এক ভাগ কার্বন পাওয়া যায়। এডিংটনের গণনা অনুসারে সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ। ২ কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রায় এই পরিমাণ কার্বন ও হাইড্রোজেন-কেন্দ্রের সংঘর্ষে ও রূপান্তরের ফলে কি হারে তেজ নির্গত হওয়া সম্ভব বেটে তাহা গণনা করিয়াছেন। বেটের গণনায় দেখা যায় সূর্য হইতে নির্গত সমস্ত তেজ উপরোক্ত রূপান্তর-প্রক্রিয়ার ফলে পাওয়া যাইতে পারে। বেটের পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার ফলে সূর্যে কার্বনের পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না বটে, কিন্তু হাইড্রোজেনের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাইবে এবং হিলিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্বভাবতই আশঙ্কা হয় হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তেজ বিকীরণের ক্ষমতা কমিতে থাকিবে—উজ্জলতা ও তাপমাত্রা কমিয়া যাইবে—ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া সূর্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অধ্যাপক গ্যামো আশ্বাস দিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন বর্তমানে সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের উজ্জলতা কমিবে না, পরন্তু বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

আলোক বা তাপ বহন করার ক্ষমতা সব পদার্থের সমান নয়। হিলিয়াম এই বিষয়ে হাইড্রোজেন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সূর্যে হাইড্রোজেন হ্রাস এবং হিলিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইবে, কারণ সৌরতেজকে অধিক পরিমাণ হিলিয়াম-স্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে হইবে। এই আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে



হাইড্রোজেন কেন্দ্রের হিলিয়াম কেন্দ্রে রূপান্তর দ্রুততর হইতে থাকিবে এবং আরও বেশি তাপ সৃষ্টি হইবে। অধ্যাপক গ্যামোর (Gamow) গণনা অনুসারে সূর্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে সূর্যের তেজ বিকীরণের শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সূর্যের আয়তনও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে।

অধ্যাপক গ্যামোর গণনায় ভবিষ্যতে সূর্যের আয়তন ও দীপ্তির কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে পূর্ব পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে দেখান হইল।

সূর্যের তেজবিকীরণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। সেই অবস্থা কল্পনা করা ভয়াবহ। সাগর মহাসাগর শুষ্ক হইয়া যাইবে, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর ধূ ধূ করিবে। এই পরিবর্তন ঘটিতে বহু কোটি বৎসর লাগিবে ইহাই একমাত্র আশ্বাসের বিষয়। বিগত বহু লক্ষ বৎসরে সূর্যের হাইড্রোজেন শতকরা এক ভাগ হ্রাস পাইয়াছে এবং তজ্জনিত ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধিও অতি সামান্যই হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিজগতে বিবর্তনের ফলে অধিকতর তাপসহ প্রাণীর উদ্ভব হইবে আশা করা অসঙ্গত নয়। অবশ্য বর্তমান যুগের মনুষ্য অথবা প্রাণিজগতের উচ্চস্তরের কোনও জীবই সেই অবস্থা পর্যন্ত জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।

সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হইলে তাহার জীবনীশক্তি শেষ হইবে। তখন ধীরে ধীরে সূর্যদেহের সংকোচন আরম্ভ হইবে—উজ্জ্বলতা কমিতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে সূর্য মৃত্যুপথে অগ্রসর হইবে।

জরা ও মৃত্যু

সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হইবার পরেও কিছুকাল স্বীয় দেহ সংকোচনজনিত তাপসৃষ্টির ফলে সূর্যের পূর্ব গৌরব না থাকিলেও কিছু দীপ্তি থাকিবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সূর্যের তাপমাত্রা কমিয়া যখন পৃথিবী অথবা চন্দ্রের কাছাকাছি হইবে তখন সূর্যের অবস্থাটা দাঁড়াইবে কিরূপ? আমরা কল্পনা করিতে পারি সূর্য সেই অবস্থায় একটি বৃহদাকার

পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে। ভূপৃষ্ঠ যেরূপ কঠিন স্তরে আবৃত কিন্তু কঠিন স্তরের নিম্নে গলিত ধাতব পদার্থ রহিয়াছে, সূর্যেও হয়ত সেইরূপ হইবে। কিন্তু বাস্তবিক সূর্যের বৃহদায়তন ও ভরের জন্য অনুত্তপ্ত অবস্থায় সূর্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পৃথিবী অথবা অন্যান্য গ্রহের মত হইবে না। কঠিন জড় বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে বাহিরের স্তরের পদার্থের চাপ পড়ে। এই চাপের পরিমাণ নির্ভর করে সেই বস্তুপিণ্ডের ভরের উপর। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাহা ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের বহু লক্ষ গুণ বেশি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে চাপের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের দুই কোটি গুণ বেশি। আরও বড় জড়বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ আরও অধিক হয়। বৃহস্পতির কেন্দ্রস্থলে চাপের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠের বায়ুর চাপের প্রায় ১৫ কোটি গুণ বেশি। সূর্যের তাপমাত্রা কমিয়া সৌরপৃষ্ঠ কঠিন স্তরে আবৃত হইলে সূর্যের কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ হইবে ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের কয়েক শত কোটি গুণ বেশি। সাধারণ কোনও পরমাণুর উপর এই পরিমাণ চাপ পড়িলে তাহারা অক্ষত দেহে থাকিতে পারে না। বায়বীয় পদার্থের উপর সামান্য চাপ দিলেই সংকোচন হয় এবং পরমাণুগুলির পরস্পর দূরত্ব কমিয়া যায়। কিন্তু কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি এত ঘননিবিষ্ট ভাবে অবস্থিত যে খুব বেশি চাপ দিলেও তাহাদের দূরত্ব বিশেষ কমিতে পারে না এবং সেইজন্যই চাপের ফলে কঠিন পদার্থের বিশেষ সংকোচনও হয় না। কিন্তু চাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইবে যখন পরমাণুগুলির পূর্বরূপ আর থাকিবে না। তাহাদের বাহিরের ইলেক্ট্রনের খোলস চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধারণ অবস্থায় পদার্থ মাত্রই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুগুলির প্রত্যেকের স্বকীয় ইলেক্ট্রনের আবেষ্টনী আছে। একটি কেন্দ্রের চতুর্দিকে যতখানি জায়গা অধিকার করিয়া ইলেক্ট্রনগুলি ঘুরিতে থাকে, তাহার ভিতরে অন্য কোনও পরমাণুর প্রবেশ নিষেধ। সাধারণ অবস্থায় একটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন আর

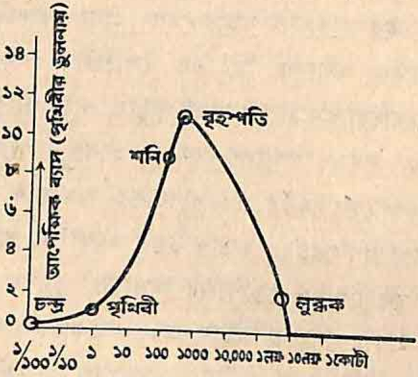
একটি পরমাণুর ইলেক্ট্রনের আবেষ্টনীর ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু চাপের মাত্রা অত্যন্ত বেশি (ভূপৃষ্ঠের বায়ুর চাপের বহু কোটি গুণ অধিক) হইলে পরমাণুর ইলেক্ট্রন-আবেষ্টনীর অস্তিত্ব আর থাকে না। সেই অবস্থায় পদার্থকে আর কতকগুলি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ পরমাণু সমষ্টিরূপে গণ্য করা চলিবে না—থাকিবে কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট পরমাণু-কেন্দ্র এবং বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রনসমষ্টি। সেই অবস্থায় বস্তুপিণ্ডের আয়তনও খুব সংকুচিত হইবে, কারণ সম্পূর্ণ পরমাণুর আয়তনের তুলনায় কেন্দ্র অথবা ইলেক্ট্রনের আয়তন লক্ষ গুণে ক্ষুদ্র।* অতএব কঠিন পদার্থের উপর চাপ পড়িলে সাধারণ অবস্থায় তাহাদের আয়তনের বিশেষ পরিবর্তন না হইলেও চাপের মাত্রা একটি সীমা অতিক্রম করিলে কঠিন পদার্থের দেহেরও দ্রুত সংকোচন হইতে থাকে। কঠিন পদার্থের এই অবস্থা বায়বীয় পদার্থের সহিত তুলনীয়। কি পরিমাণ চাপ পড়িলে অণুর ইলেক্ট্রন-আবেষ্টনী ভাঙিয়া কঠিন পদার্থের এইরূপ বিকৃতি ঘটিবে তাহা প্রথম গণনা করিয়া বলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারী। অধ্যাপক কোঠারী গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন চাপের মাত্রা ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের ১৫ কোটি গুণ বেশি হইলে সাধারণ পদার্থের পরমাণুর ইলেক্ট্রন আবেষ্টনী ভাঙ্গিয়া যাইবে। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির অভ্যন্তরে পদার্থের উপর প্রায় এই পরিমাণ চাপ পড়ে। অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় না থাকিলে বৃহস্পতি অপেক্ষা বৃহৎ যে কোনও বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে চাপের ফলে পদার্থের পরমাণুর এই প্রকার বিকৃতি ঘটিবে এবং সংকোচনের ফলে তাহাদের আকার অনেক ছোট হইয়া যাইবে। অধ্যাপক কোঠারীর গণনার ফলে দাঁড়াইল— অনুত্তপ্ত অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনও বস্তুপিণ্ড বৃহস্পতি অপেক্ষা

---

* পরমাণুর ব্যাসের পরিমাণ ·০০০,০০০,০০৪ ইঞ্চি। ইলেকট্রনের ব্যাসের পরিমাণ ·০১০,০০০,০০০,০০০,০৮ ইঞ্চি মাত্র। কেন্দ্রের আকারও ইলেকট্রনের সহিত তুলনীয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও ক্ষুদ্র।

বৃহদায়তন হইতে পারে না। মৃত সূর্যের আয়তনও বৃহস্পতি অপেক্ষা ছোট হইবে।

নক্ষত্রের মৃত্যুর পর তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে সেই সম্বন্ধে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এস. চন্দ্রশেখর বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত নক্ষত্রের আয়তন তাহার ভরের উপর নির্ভর করিবে। কত ভর হইলে আয়তন কত বড় হইবে তাহা চন্দ্রশেখরের গণনা হইতে জানা যায়। স্বল্পভর বস্তুপিণ্ডসমূহের আয়তন ভরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কিন্তু বস্তুপিণ্ডের ভর যখন বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক হইবে তখন আর এই নিয়ম চলিবে না। তখন কিন্তু ভর বৃদ্ধির সহিত আয়তন ক্ষুদ্র হইতে থাকিবে। চন্দ্রশেখর ও কোঠারীর গণনা অনুসারে মৃত গ্রহ নক্ষত্রের ভর ও ব্যাসের সম্বন্ধ নিম্নরেখাচিত্রে দেখান হইল।



ইঁহাদের গণনা অনুসারে কোনও মৃত নক্ষত্রের ভর পৃথিবীর ভরের ৫ লক্ষ গুণ হইলে তাহার আকার তিরোহিত হওয়া উচিত। মৃত সূর্যের ব্যাস বৃহস্পতির দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র হইবে। এইরূপ সংকুচিত

অবস্থায় সৌর পদার্থের বস্তুগুরুত্ব হইবে গড়ে জলের গুরুত্বের ৩০ লক্ষ গুণ। বাহিরের স্তর অপেক্ষা ভিতরের স্তরের পদার্থের গুরুত্ব অবশ্য বেশি হইবে। চন্দ্রশেখরের গণনায় মৃত সূর্যের কেন্দ্রে এক বর্গ ইঞ্চি পদার্থের ওজন হইবে ৪৬৮ টন। অসম্ভব মনে হইলেও এই সব বৈজ্ঞানিকের কল্পনা অলীক নয়। মৃত নক্ষত্রের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নয়, কারণ মৃত নক্ষত্র হইতে কোনও আলোক বা তাপ বিকীরণ হয় না। তবে মরণোন্মুখ নক্ষত্র খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব নয়। সাধারণ নক্ষত্রের তুলনায় মরণোন্মুখ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা খুবই অল্প হইলেও আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং বস্তুগুরুত্ব খুব বেশি হইবে।

লুব্ধকের এক সাথীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার দীপ্তি খুব সামান্য— লুব্ধকের $\frac{১}{১৩০০০}$ ভাগ মাত্র। আশ্চর্যের বিষয় ঔজ্জ্বল্য এত সামান্য হওয়া সত্ত্বেও এই তারকার আলোক বর্ণবিশ্লেষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় ইহার উপরিভাগের তাপমাত্রা খুব বেশি, প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রী। এত অধিক তাপমাত্রা সত্ত্বেও এত অল্প দীপ্তি হওয়ার কারণ ইহার আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গণনার ফলে দেখা গিয়াছে, ইহার আয়তন সূর্যের $\frac{১}{২৫০০০}$ ভাগ মাত্র। কিন্তু ইহার ভর প্রায় সূর্যের সমান, এবং ইহার পদার্থ-গুরুত্ব জলের ২ লক্ষ গুণ। মৃত তারকায় যে সকল লক্ষণ বর্তমান থাকা উচিত, লুব্ধকের সাথীর মধ্যে সেই সমস্তই দেখা যায়। কোঠারী ও চন্দ্রশেখরের গণনায় এই নক্ষত্রের মৃত অবস্থায় যে আয়তন হওয়া উচিত এখনও ইহার আয়তন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। মৃত্যুর পূর্বে ইহার দেহের আরও কিছু সংকোচন হইবে এবং মৃত্যুর পরে ইহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।

এই শ্রেণীর আরও মরণোন্মুখ নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে— তাহাদিগকে 'white dwarf' (শ্বেত বামন) নামে অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক ফাউলার প্রথমে ইহাদের নিদান নির্ণয় করেন এবং বলেন ইহারা মৃত্যু-পথের যাত্রী।

আকস্মিক দুর্ঘটনা

আমাদের সময়ের মাপকাঠি অনুসারে সূর্য ও নক্ষত্রের জীবনীশক্তি ক্ষয় হয় অতি ধীরে ধীরে। সাধারণ নক্ষত্রের আয়ু অন্যূন এক হাজার কোটি বৎসর। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু ব্যতীত নক্ষত্রের জীবনে অকস্মাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি? বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন কদাচিৎ আকাশের এক কোণে একটি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায় এবং অল্পকালের মধ্যে আবার নক্ষত্রটি পূর্বের রূপ ফিরিয়া পায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্য কয়েক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পায়, কখনও ২ কোটিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। খুব নগণ্য ও দীপ্তিহীন একটি নক্ষত্রও কি এক আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে কয়েক দিনের মধ্যে আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্থান অধিকার করিতে পারে। ইহাদিগকে 'নোভা' (নূতন তারকা) আখ্যা দেওয়া হয়। যীশুর জন্মকালে যে 'বেথেলহেমের তারকা' দেখা গিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে তাহাও সম্ভবত একটি নোভা। ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে নবেম্বর মাসে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ Tycho Brahe একটি নোভা দেখিয়াছিলেন। নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ইহাকে দিবাভাগেও দেখা যাইত। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে কেপলার অনুরূপ আর একটি নোভা দেখিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে একটি নোভার আবির্ভাব হইয়াছিল। বাস্তবিক নোভার আবির্ভাব দুর্লভ ঘটনা নয়। দূরত্ব হেতু অনেক নোভা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। জ্যোতির্বিদ্‌দের পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে আমাদের নক্ষত্রজগতেই বৎসরে প্রায় ২০টি নোভার আবির্ভাব হয়।

কোনও কোনও নোভার উজ্জ্বলতা সাধারণ নোভার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা বহুসহস্রগুণ অধিক—ইহাদের সুপার-নোভা বলা হয়। সুপার-নোভার উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা কয়েক শত কোটি গুণ বেশি। ইহাদের

আবির্ভাব অত্যন্ত বিরল। আমাদের নক্ষত্রজগতে ৩০০ বৎসরে একটি সুপার-নোভার আবির্ভাব হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু ৩০০ বৎসরের মধ্যে আমাদের নক্ষত্রজগতে কোনও সুপার-নোভার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অতএব শীঘ্রই একটির আবির্ভাব হইবে আশা করা অন্যায় নয়।

একটি সুপার-নোভার আবির্ভাব দেখিবার জন্য ৩০০ বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, ইহা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অদৃষ্টের পরিহাস বটে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নৈরাশ্যের কারণ নাই। সহস্র কোটি নক্ষত্র লইয়া আমাদের নক্ষত্রজগত—সেইখানে ৩০০ বৎসরে একটি সুপার-নোভার আবির্ভাব হয়। কিন্তু আমাদের দূরবীনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে আরও বহুলক্ষ নক্ষত্রজগতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নক্ষত্রজগতে যদি গড়ে ৩০০ বৎসরে একটি সুপার-নোভার আবির্ভাব ঘটে তাহা হইলে প্রতি বৎসরে বিভিন্ন নক্ষত্রজগতে বেশ কয়েকটি সুপার-নোভার সন্ধান পাওয়া উচিত। অবশ্য দূরত্বনিবন্ধন এই সব সুপার-নোভার দীপ্তি খুবই সামান্য প্রতীয়মান হইবে। Quicky ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে দূর দূরান্তরে অবস্থিত নক্ষত্রজগতে সুপার-নোভার আবির্ভাবের অনুসন্ধানে রত হন। প্রায় দুই মাস কাল পর্যবেক্ষণের পরে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বহুদূরে এক নীহারিকায় (N. G. C. 4157) এক সুপার-নোভার আবির্ভাবের সন্ধান পাইলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই নোভার আবির্ভাব ঘটে Quickyর জন্মের বহু পূর্বে—এমন কি পৃথিবীতে সভ্য মানবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে। এই নীহারিকা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে লাগে ৪০ লক্ষ বৎসর। ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ফলে সেই সুদূর নীহারিকার একটি নক্ষত্রের সুপার-নোভার অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল—সেই বার্তা আলোক যানে পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিল ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। পৃথিবীবাসী জ্যোতির্বিদ্ সেই দিন ঘোষণা করিলেন

আজ N. G. C. 4157 নীহারিকায় একটি সুপার-নোভার আবির্ভাব হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৩৭ সালে ঘটিয়াছে বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ হইল, সেই নীহারিকার ইতিহাসে সেই ঘটনার কাল ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সুদূর নীহারিকাপুঞ্জে আরও কতকগুলি সুপার-নোভার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সূর্যে সহসা বিস্ফোরণের ফলে 'নোভা' অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি? বিস্ফোরণের ফলে 'নোভা' অবস্থাপ্রাপ্তির অনতিকাল পূর্বে নক্ষত্রের আকৃতি-প্রকৃতিতে কোনও বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় কিনা জানিলে, সূর্যের নোভা হইবার আশু সম্ভাবনা আছে কিনা নির্ণয় করা সম্ভব। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে আকাশের উত্তর ভাগে হারকিউলিস নামে যে নোভার আবির্ভাব হয় বিস্ফোরণের পূর্বে সেই নক্ষত্রের আলোক বর্ণ-বিশ্লেষণ যন্ত্রে কয়েকবার পরীক্ষা করা হইয়াছিল, সেই নক্ষত্রের ব্যবহারে কোনও রূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় আকস্মিক বিস্ফোরণের পূর্বে নক্ষত্রের অবস্থায় কোনও প্রকার অসাধারণত্ব থাকে না এবং একটি অতি সাধারণ নক্ষত্রেরও কোনও প্রকার সংকেত না করিয়া নোভা অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

যদি আমাদের সূর্যে এই প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলে প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী ও সৌরজগতের সব গ্রহ-বিগ্রহ নিমেষ মধ্যে বাষ্পীয় রূপ ধারণ করিবে—কি ব্যাপার ঘটিল বুঝিবার অবকাশ আমরা পাইব না। কেবল দূর দূরান্তরে মহাশূন্যে অন্য কোনও সৌরজগতের গ্রহবাসী কোনও বৈজ্ঞানিকের দূরবীনে হয়ত দূরাকাশে আর একটি নূতন নোভার সন্ধান মিলিবে। বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাওয়ার এইটুকু মাত্র চিহ্ন থাকিবে।

বাস্তবিক কি কারণে নক্ষত্রের আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে বৈজ্ঞানিক আজও সঠিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে নানাপ্রকার

জল্পনাকল্পনা বৈজ্ঞানিক মহলে চলিতেছে। দুইটি নক্ষত্রের আকস্মিক সংঘর্ষে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা খুবই অল্প, কারণ মহাশূন্যে নক্ষত্রের বসতি এত বিরল যে বহুকোটি বৎসরে দুইটি নক্ষত্রের এইরূপ সংঘর্ষ ঘটিতে পারে।

নক্ষত্রজগত সৃষ্টির পূর্বে মহাশূন্য পরিব্যাপ্ত হইয়া যে সূক্ষ্ম বাষ্প বিরাজ করিত, নক্ষত্র সৃষ্টির পরেও স্থানে স্থানে সেই বাষ্প রহিয়া গিয়াছে, ইহা বাষ্পীয় নীহারিকা নামে পরিচিত। শূন্যে চলিতে চলিতে কোনও নক্ষত্র যদি বাষ্পীয় নীহারিকার মধ্যে প্রবেশ করে, সংঘর্ষের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হইবে তাহাতে সেই নক্ষত্রের দীপ্তি অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাইবে। সূর্যের গতিবেগ সেকেণ্ডে কিঞ্চিদধিক ১০ মাইল। যদি কোনও বাষ্পীয় নীহারিকার প্রবেশের ফলে সূর্যের গতিবেগ হ্রাস পাইয়া ইহার অর্ধেক হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হইবে তাহাতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্যের দীপ্তি কয়েক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পাইবে। উপরোক্ত কারণে নোভা সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে কিন্তু সুপার-নোভা সৃষ্টি সম্ভব নয়। Quicky সুপার-নোভা সৃষ্টির একটি কারণ অনুমান করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর ও কোঠারীর গণনা অনুসারে মৃত নক্ষত্রের কত ভর হইলে আয়তন কত বড় হইবে সেই সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। ভর সূর্যের প্রায় দেড় গুণ হইলে তাঁহাদের গণনা অনুসারে আকার তিরোহিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সূর্যের দেড়গুণ অপেক্ষা অধিক ভর হইলে সেই নক্ষত্রের মৃত্যুর পর যে সংকোচন আরম্ভ হইবে তাহার শেষ নাই। বাস্তবিক পক্ষে সংকোচনের একটি সীমা থাকিতে বাধ্য। মৃত নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরমাণুর কেন্দ্র ও বিক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন থাকে। সংকোচনের ফলে তাহাদের পরস্পর দূরত্ব কমিয়া অবশেষে এমন অবস্থা আসিবে যখন আর পরমাণুর কেন্দ্র ও ইলেক্ট্রনগুলির মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। তখন সমস্ত পদার্থ একটি অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র ও ইলেক্ট্রন-

সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার পর আর সংকোচন অসম্ভব। এই অবস্থায় পদার্থের একটি কণার ওজন বহু টন হইবে।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরে যখন পদার্থের এই রূপান্তর ঘটিবে তখন এত দ্রুত সংকোচন হইবে যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নক্ষত্রের ব্যাস পূর্বের শতভাগের এক ভাগ হইতে পারে। এত দ্রুত সংকোচনের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হইবে তাহাদ্বারা নক্ষত্রের সুপার-নোভা অবস্থা প্রাপ্তি সম্ভব। এই প্রচণ্ড তাপ নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ হইতে যখন বাহির হইয়া আসিবে তখন নক্ষত্রের বাহিরের স্তরের সবেগে উৎক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব। সুপার-নোভার চতুর্দিকে যে ক্রমবর্ধমান বাষ্পীয় আচ্ছাদন দেখা যায় এইভাবেই বোধ হয় তাহার সৃষ্টি। মহাকাশে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের চতুর্দিকেও সূক্ষ্ম বাষ্পীয় আবরণ দেখা যায়। সুদূর অতীতে এই সকল নক্ষত্রের সম্ভবত সুপার-নোভা অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে হারকিউলিস নামে যে নোভার আবির্ভাব হয় কিছুকাল পরে দেখা যায় ইহা বিভক্ত হইয়া দুইটি নক্ষত্র হইয়াছে এবং ক্রমশ তাহাদের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতেছে।

নক্ষত্রের শৈশব ও বিবর্তন

সূর্যের জীবনযাত্রার সহিত অন্যান্য সাধারণ (normal) নক্ষত্রের জীবনযাত্রার বিশেষ পার্থক্য নাই। সূর্যে হাইড্রোজেনের হিলিয়াম কোষে পরিণতির ফলে তেজবিকীরণ হয় অন্যান্য সাধারণ নক্ষত্রেও সেই প্রক্রিয়াতেই তেজবিকীরণ হয়। যে সকল সাধারণ নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ও পদার্থগুরুত্ব আমরা জানি তাহাদের অভ্যন্তরে

হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরের ফলে কি পরিমাণ তেজ সৃষ্টি হইবে, গণনা করিলে সেই সকল নক্ষত্রের আলোক বিকীরণের ক্ষমতা কত হওয়া উচিত বলা যায়। বাস্তবিক গণনার ফলে যাহা পাওয়া যায়, সাধারণ নক্ষত্রের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে আকাশে এক শ্রেণীর অতিকায় রক্তবর্ণ নক্ষত্র দেখা যায়। তাহাদের তাপমাত্রা খুব অল্প হইলেও বিশাল আকারের জন্য আলোক বিকীরণের ক্ষমতা খুব বেশি হয়। Capella A নামক রক্তবর্ণ নক্ষত্রের ব্যাস সূর্যের দশ গুণ কিন্তু ভর মাত্র সূর্যের ৪ গুণ এবং পদার্থগুরুত্ব (জলের তুলনায়) ·০০৫। Capellaর আর এক নিকট প্রতিবেশী নক্ষত্রের ব্যাস সূর্যের ১৬০ গুণ, কিন্তু ভর মাত্র সূর্যের ১৫ গুণ এবং পদার্থগুরুত্ব ·০০০০০৫। সব রক্তবর্ণ নক্ষত্রের পদার্থগুরুত্ব খুব অল্প। সর্বাপেক্ষা অল্প তাপমাত্রা বিশিষ্ট যে নক্ষত্র (E. aurigal) আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ব্যাস সূর্যের ২০০০ গুণ, ভর মাত্র সূর্যের ২৫ গুণ এবং পদার্থগুরুত্ব ·০০০,০০০,০০৩। ইহার উপরিভাগের তাপমাত্রা ১৭০০ ডিগ্রী—আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাও সূর্যের তুলনায় খুবই অল্প। E. aurigal নামক নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলে তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রীর কিছু কম। এত অল্প তাপমাত্রায় কার্বন নাইট্রোজেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর ভাঙাচোরা বা রূপান্তর সম্ভব নয়। অধ্যাপক গ্যামোর মতে এই তাপমাত্রায় ভারী হাইড্রোজেন, লিথিয়াম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভর পরমাণুর কোষের রূপান্তর সম্ভব। ১০ লক্ষ ডিগ্রী তাপমাত্রায় ভারী হাইড্রোজেন কোষ ও প্রোটনের সংঘর্ষে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়। তাহা অপেক্ষা বেশি তাপমাত্রায় (৫০ লক্ষ ডিগ্রী) লিথিয়াম কোষ ও প্রোটন সংঘর্ষে হিলিয়াম কোষ সৃষ্টি, বেরিলিয়াম কোষ ও প্রোটন সংঘর্ষে লিথিয়াম ও হিলিয়াম কোষ সৃষ্টি, বোরোন কোষ ও প্রোটন সংঘর্ষে হিলিয়াম কোষ সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা সূর্যের কাছাকাছি হইলে (২ কোটি

ডিগ্রীর কিছু কম) বোরোন কোষ ও প্রোটন সংঘর্ষে কার্বন কোষ সৃষ্ট হয়। অতিকায় রক্তবর্ণ নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রস্থলে যে তাপমাত্রা বিদ্যমান তাহাতে উপরিলিখিত আণবিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়া সম্ভব। সূর্যের অভ্যন্তরে আণবিক প্রক্রিয়ার সহিত এই সকল নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ আণবিক প্রক্রিয়ার কিছু পার্থক্য আছে। সূর্যে আণবিক প্রক্রিয়ার ফলে কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণে কোনও ব্যতিক্রম হয় না। ইহারা কেবল হাইড্রোজেনের হিলিয়াম কোষে পরিণত হওয়ার সহায়তা করে। কিন্তু রক্তবর্ণ নক্ষত্রগুলিতে ভারী হাইড্রোজেন, লিথিয়াম, বোরোন, বেরিলিয়াম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর পরমাণুগুলি আণবিক রূপান্তরের ফলে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। অতএব এই সব প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। অতিকায় রক্তবর্ণ নক্ষত্রের নাতিদীর্ঘ জীবনকে নক্ষত্রের শৈশবাবস্থা বলা যায়। নক্ষত্রের শৈশবকাল তাহার দীর্ঘ জীবনের তুলনায় অতি অল্প কাল স্থায়ী, কারণ লিথিয়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি স্বল্পভর পরমাণু নক্ষত্রের গঠনোপাদানের শতকরা এক ভাগেরও কম।

এখন আমরা নক্ষত্রের জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে পারি। নক্ষত্রের জীবনের সূচনা হয় তাপ এবং চাপ হীন বিশাল বাষ্পরাশি রূপে—সেই বাষ্পরাশিতে বিভিন্ন ওজনের সকল রকমের পরমাণু সমাবেশ হয়। মহাকর্ষজনিত সংকোচনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া দশ লক্ষ ডিগ্রীর কাছাকাছি হইলে ভারী হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু-কোষের সংঘর্ষে হিলিয়াম কোষ সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং প্রচুর তেজ সৃষ্টি হয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া নক্ষত্রের দেহে সংকোচন বন্ধ হয় এবং সমস্ত ভারী হাইড্রোজেন নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ফলে তেজ-বিকীরণ চলিতে থাকে। ভারী হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইলে পুনরায় নক্ষত্রদেহের সংকোচন আরম্ভ হয় এবং সংকোচনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা ৫০ লক্ষ ডিগ্রীতে পৌছাইলে লিথিয়াম কোষ ও

প্রোটনের সংঘর্ষে হিলিয়াম কোষ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমে কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা যখন দুই কোটি ডিগ্রীর কাছাকাছি হয় তখন নক্ষত্র শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে, তখন রক্তবর্ণ অতিকায় নক্ষত্রের রূপ পরিবর্তিত হইয়া সূর্যের শ্রেণীর সাধারণ নক্ষত্রের জীবন আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় কার্বন ও নাইট্রোজেন পরমাণুকোষের সহায়তায় হাইড্রোজেন কোষের হিলিয়াম কোষে রূপান্তর আরম্ভ হয়। হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত (সূর্য ও সাধারণ নক্ষত্রে হাইড্রোজনের পরিমাণ খুব বেশি) এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাই নক্ষত্রের সুদীর্ঘ যৌবন কাল। হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইলে নক্ষত্রদেহের সংকোচন আরম্ভ হয়, ক্রমে আসে জরা এবং মৃত্যু।

নক্ষত্রজগতে বিগতযৌবন ও জরাগ্রস্ত অপেক্ষা কিশোর ও যুবা নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। নক্ষত্রের হাইড্রোজেনের পরিমাণই তার আয়ুর পরিমাপক। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে নক্ষত্রে যে হারে হাইড্রোজেন ব্যয় হয় বার্দ্ধক্যে হয় সেই তুলনায় অনেক বেশি দ্রুতগতিতে। নক্ষত্র জীবনের প্রথম নয়-দশমাংশ কালে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ব্যয় হয় কেবল মাত্র শেষ দশমাংশেই সেই পরিমাণ হাইড্রোজেন ব্যয় হয়। অতএব বলা যায় জীবনের নয়-দশমাংশ কাল কাটাইয়া নক্ষত্র মধ্যবয়সে পৌছায়। মানুষের জীবন মোটামুটি ৭০ বৎসর ধরিলে সে মধ্যবয়সে পৌছায় ৩৫ বৎসরে। সূর্য অথবা নক্ষত্রের বেলায় কিন্তু পূর্ণ আয়ু ৭০ বৎসর ধরিলে মধ্যবয়সে পৌছাইতে তাহার লাগিবে ৬০ বৎসর। নক্ষত্রজগতের অধি-বাসীরা জীবজগতের অধিবাসীদের হিংসার পাত্র সন্দেহ নাই। সূর্য ও নক্ষত্রগোষ্ঠী লইয়া আমাদের যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহার বয়স ২০০ কোটি বৎসরের বেশি নয়। এই নাতিদীর্ঘকাল মধ্যে অধিকাংশ নক্ষত্রই শৈশব অতিক্রম করিয়া প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। পূর্বে দেখিয়াছি সূর্যের হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইবে ১০০০ কোটি বৎসর পরে, তখন

আরম্ভ হইবে তাহার বার্ধক্য। সূর্যের শ্রেণীর সাধারণ যে সকল নক্ষত্রের তেজ বিকীরণের ক্ষমতা সূর্যের কাছাকাছি তাহাদের যৌবন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। নক্ষত্রজগতে এই শ্রেণীর সাধারণ নক্ষত্রের সংখ্যাই খুব বেশি। অল্পসংখ্যক কতকগুলি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য ও তেজ বিকীরণের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। ইহাদের হাইড্রোজেন দ্রুত নিঃশেষিত হইতেছে এবং তাহারা ইতিমধ্যে বার্ধক্যপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের আয়ু সূর্যের তুলনায় খুব অল্প—কয়েক কোটি বৎসর মাত্র।

নক্ষত্র ও গ্রহের জন্ম

পূর্বেই বলা হইয়াছে নক্ষত্রের জীবন আরম্ভ হয় সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত অনুত্তপ্ত (তাপমাত্রা কয়েক শত ডিগ্রী মাত্র) বিশাল বাষ্পসমষ্টিরূপে। ইহাদের আনুমানিক জন্মকাল ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। নক্ষত্রমণ্ডলের জন্মের পূর্বে এক অতি সূক্ষ্ম বাষ্প সমগ্র বিশ্বচরাচর অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। এই সূক্ষ্ম বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল ·০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,১ (জলের তুলনায়)। একদা এই অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম বাষ্পমণ্ডলে কোনও কারণে অকস্মাৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টির ফলে বাষ্পমণ্ডলী বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বহুধা বিভক্ত বাষ্পমণ্ডলী হইতেই অগণিত নক্ষত্রের সৃষ্টি। সার জেমস্ জিনস্ দেখাইয়াছেন, কোনও অবিচ্ছিন্ন বাষ্পমণ্ডলের পরিসর খুব বিশাল (নক্ষত্রজগতের পরিধি অপেক্ষাও বহুগুণ বড়) হইলে উহা বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য। মহাকর্ষ শক্তির ফলেই সেই বিশাল বাষ্পমণ্ডল বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িবে। খণ্ডিত বাষ্পমণ্ডলগুলির ব্যাস দুই তিন

আলোক বৎসর পর্যন্ত হয় এবং ভর হয় প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০, ০০০,০০০ টন। কোনও ক্ষেত্রে কদাচিৎ খণ্ডিত বাষ্পমণ্ডলের আকার ও ভর ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে পরে উহা আবার বিভক্ত হইয়া যায়। এই সকল খণ্ডিত বাষ্পমণ্ডলই ক্রমে নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে।

বিশ্বসৃষ্টিরহস্য লইয়া বৈজ্ঞানিক যে দিন হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, পৃথিবীর জন্মরহস্য লইয়া সেইদিন হইতে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে দার্শনিক কাণ্ট সর্বপ্রথমে পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন এবং ফরাসী বৈজ্ঞানিক লা প্লাস তাঁহার মত সমর্থন করেন। কাণ্ট ও লা প্লাসের মতে সূর্যের শৈশবে যখন তাহার দেহ সংকোচন আরম্ভ হয় সেই সময় ঘূর্ণীয়মান সূর্যদেহ হইতে কেন্দ্রাপসারী শক্তির ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহা হইতে গ্রহসমূহ সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক পৃথিবী বা অপর গ্রহের জন্ম এইভাবে হয় নাই। কারণ ঘূর্ণীয়মান সূর্য হইতে কেন্দ্রাপসারী শক্তির ফলে কোনও অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা সংকুচিত হইয়া একটি বা কয়েকটি গ্রহ সৃষ্টি হইত না, পরন্তু তাহা অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডের সমষ্টিতে পরিণত হইত। শনি গ্রহকে পরিবেষ্টিত করিয়া যে চক্র দেখা যায় তাহার সৃষ্টি এইভাবে হইয়াছিল এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে এই চক্র অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডের সমষ্টি।

সৃষ্টির আদিযুগে সূর্যের প্রথম যৌবনে মহাশূন্যে বিচরমান অপর এক অতিকায় নক্ষত্রের সহিত সূর্যের অতি নিকট সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরের জল স্ফীত হইয়া জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হয়, ইহা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। আকর্ষণের প্রাবল্য নির্ভর করে আকর্ষণকারীর ভর ও দূরত্বের উপর। আকর্ষণকারীর ভর বেশি এবং দূরত্ব অল্প হইলে আকর্ষণ প্রবল হয় এবং প্রবল আকর্ষণের ফলে আকৃষ্ট বস্তুপিণ্ডের এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কোনও এক অজ্ঞাত অতিকায় নক্ষত্রের সহিত অতি নিকট সাক্ষাতের ফলে সূর্যদেহের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী ও

অন্যান্য গ্রহের জন্ম হয়। জন্মক্ষণ হইতে পৃথিবী চিরদিনের জন্য জননীর আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয় তাহার পিতৃপরিচয় আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মহাকাশের অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পৃথিবীর জনক কে বলিবে? পৃথিবীর জন্মের প্রায় দুই শত কোটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর জনকজননীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর জনক আজও পৃথিবীর দুই চারিটি ভ্রাতা-ভগিনীকে লইয়া মহাকাশের কোনও দূর প্রান্তে বিরাজ করিতেছে কল্পনা করা অন্যায় নয়।

বর্তমানে নক্ষত্রজগতের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব এত অধিক যে দুইটি নক্ষত্রের নিকট সাক্ষাতের সম্ভাবনা খুবই অল্প। বহু দীর্ঘকালের মধ্যে কয়েক শত কোটি নক্ষত্রের মধ্যে দুই একবার মাত্র দুইটি নক্ষত্রের নিকট সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে বিশ্বজগতে গ্রহসৃষ্টি অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এমন কি ইহাও অসম্ভব নয় যে নক্ষত্রজগতে একমাত্র সূর্যেরই এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিশাল বিশ্বে কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে কেবল আমাদের সূর্যেরই গ্রহ-বিগ্রহ থাকিবে এতদূর পক্ষপাত বিশ্বস্রষ্টা করিবেন কি? আইনস্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতে বিশ্বজগৎ অনবরত প্রসারিত হইতেছে এবং ফলে নক্ষত্রজগতের অধিবাসীদের পরস্পর দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মতবাদ ঠিক হইলে সুদূর অতীতে নক্ষত্রজগতের প্রতিবেশীদের মধ্যে দূরত্ব অনেক কম ছিল এবং সেই যুগে দুইটি নক্ষত্রের পরস্পরের নিকট সাক্ষাতের সম্ভাবনা এত বিরল ছিল না। অতএব সেই যুগে গ্রহ সৃষ্টি খুব বিরল ঘটনা ছিল না এবং আকাশের আরও বহু নক্ষত্রেরই আমাদের সূর্যের ন্যায় গ্রহ-বিগ্রহ-সমন্বিত সৌরজগৎ আছে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

উপসংহার

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত নক্ষত্রজগতের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কিছু আভাস দেওয়া হইল। এখন অতি সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের বিবর্তনের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করি।

সৃষ্টির আদিতে বিশ্বের পরিসর বর্তমানের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ছিল। তখন অত্যধিক তাপমাত্রা ও গুরুত্বসম্পন্ন এক বাষ্পমণ্ডল বিশ্বচরাচর পূর্ণ করিয়াছিল। সেই অবস্থায় অত্যধিক তাপমাত্রা হেতু পরমাণুর ভাঙাচোরা এবং রূপান্তর অবাধে ঘটিত এবং সেই সময়েই বিশ্বের বিভিন্ন মূল রাসায়নিক উপাদানগুলি বিভিন্ন পরিমাণে সৃষ্টি হয়।

এই উত্তপ্ত ঘন বাষ্পীয় পদার্থের প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ চাপের ফলে বিশ্ব-জগত ক্রমশ প্রসারিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাষ্পীয় পদার্থের তাপমাত্রা এবং গুরুত্ব কমিয়া আসিল। বহুদূর প্রসারণের পর এই নিরবচ্ছিন্ন বাষ্পরাশি অতি সূক্ষ্ম ও তাপহীন হইয়া পড়ে। একদা অকস্মাৎ এই নিরবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম বাষ্পরাশি বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই বহুধা-বিভক্ত বাষ্পরাশি হইতেই বিভিন্ন নক্ষত্রের জন্ম। জন্মের পরে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সূর্যের সহিত কোনও এক নক্ষত্রের আকস্মিক নিকট সাক্ষাতের ফলে আমাদের পৃথিবী ও সৌরজগতের জন্ম।

বাল্যাবস্থায় নক্ষত্রগুলি বর্তমানের তুলনায় অনেক বৃহদাকার এবং অপেক্ষাকৃত অনুত্তপ্ত ছিল। মহাকর্ষজনিত সংকোচনের ফলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাপমাত্রা ১০ লক্ষ ডিগ্রীর অধিক হইলে, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পরমাণুকোষের ভাঙাচোরা ও নূতন পরমাণুকোষ সৃষ্টির ফলে আণবিক তেজ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথমত, ভারী হাইড্রোজেন, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরোন প্রভৃতি স্বল্পতর পরমাণুকোষ-

গুলি হিলিয়াম কোষে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। এই অবস্থাকে নক্ষত্রের শৈশবকাল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শিশু নক্ষত্রগুলি অতিকায় রক্তবর্ণ নক্ষত্ররূপে আমাদের নিকট পরিচিত। হাল্কা পরমাণুগুলি নিঃশেষিত হওয়ার পরে নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া যখন প্রায় দুই কোটি ডিগ্রী হয় তখন কার্বন ও নাইট্রোজেনের সহায়তায় হাইড্রোজেন কোষের হিলিয়াম কোষে রূপান্তর আরম্ভ হয়। এই হইল নক্ষত্রের দীর্ঘ যৌবনারম্ভ। আমাদের সূর্যের এখন প্রথম যৌবন। কালক্রমে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হইলে, মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের দেহের সংকোচন আরম্ভ হয় এবং এই সংকোচনের ফলে কিছুকাল তেজসৃষ্টি হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংকোচনের ফলে নক্ষত্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়া নক্ষত্রদেহ দুই বা অধিক ভাগে খণ্ডিত হইতে দেখা যায়। নক্ষত্রজগতে সৃষ্টির দুই শত কোটি বৎসর পরে আজ মহাকাশে বহু মৃত নক্ষত্রের সন্ধান মিলিতেছে। ইহাদের পদার্থগুরুত্ব অত্যন্ত বেশী কিন্তু দীপ্তি অতি সামান্য। ইহারা white dwarf (শ্বেত বামন) নামে পরিচিত। আমাদের সূর্যের এই অবস্থা আসিতে এখনও বহু বিলম্ব। সূর্যের হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইবে প্রায় এক হাজার কোটি বৎসর পরে, সূর্যের দীর্ঘ আয়ুর ক্ষুদ্রাংশ মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে। সূর্যের আশু মৃত্যুর সান্ত্বনা না থাকিলেও সূর্যের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সূর্যের হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হইবার বহু পূর্বেই সমস্ত ভূপৃষ্ঠ মরুভূমিতে পরিণত হইবে।

বর্তমানে মহাকাশে যে সকল নক্ষত্র শোভা পাইতেছে কালক্রমে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এক হাজার কোটি বৎসর পরে বিশ্বের বর্তমান রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইবে। বিশ্বের ক্রমপ্রসারণের ফলে নক্ষত্রগুলির পরস্পর দূরত্ব আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং বিরলবসতি সেই নক্ষত্রজগতের অধিকাংশ অধিবাসীই মৃত অথবা মরণোন্মুখ অবস্থায় বিরাজ করিবে।

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৮	থব	থর্ব
১০	৮	৯	১
৩১	১৫	Quicky	Zwicky
৩৩	১০	Quicky	Zwicky
৩৫	১২	aurigal	aurigae
৩৫	১৬	aurigal	aurigae

২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ